দেখালে চা(র কুণ্ঠার অবধি থাকে না। 'হাল বাংলা লেখার ঢঙ' প্রবন্ধে চা(র লেখাকে প্রশংসা করে অমল ও মন্মথ দত্তের লেখাকে সমালোচনা করা হয়েছে। এ খবরে চা(আনন্দ পায় না। বরং সে দুঃখ পায়। অমলকে নিয়ে সে কাগজ বের করার কথা ভাবতে থাকে। ওদিকে উমাপতির বি(্বাসঘাতকতায় ভূপতির কাগজ উঠে যাবার জোগাড়। মতিলালও আজ ধার নেওয়ার কথা অস্বীকার করে। উমাপতি সস্ত্রীক ভূপতির গৃহ পরিত্যাগ করলে অমলও ভাবতে থাকে—মন্দার বিদায় অমলের প্রতিও নির্বাসনের নির্দেশ। হয়তো তাকেও দাদা সন্দেহ করে বসবে। তাই তার অন্যত্র কাজ জোগাড় করা উচিত। একদিন আকস্মিকভাবে অমলের বিয়ের প্রস্তাব আসে। বর্ধমানের উকিল রঘুনাথবাবু তার মেয়ের সঙ্গে অমলের বিয়ে দিয়ে তাকে বিলেত পাঠাতে চান। অমল সে প্রস্তাবে রাজী হয়ে বিলেত যাত্রা করে। ভূপতির কাগজ উঠে গেলে সে এখন স্ত্রীর কাছে থেকে স্ত্রীর মনোরঞ্জনের বিদ্যা আয়ত্ত করতে থাকে। নিজেও লেখার অভ্যাস করলে তা স্ত্রীর কাছে হাস্যকর বলে মনে হয়। অমলবিরহে চা(গোপনে গহনা বন্ধক রেখে তার নামে টেলিগ্রাম পাঠায়। চা(র এই বাড়াবাড়িতে ভূপতির মনে একটু সন্দেহ দেখা দেয়। ত্র(মে সে আবিষ্কার করে ফেলে অমল-চা(র প্রকৃত সম্পর্ক। ভূপতি তার সমস্ত খাতাপত্র জ্বালিয়ে দেয়। সারাজীবন কাজের পিছনে মত্ত থেকে সে আজ বুঝতে পারে সে কী হারিয়েছে। আজ সম্পাদক হয়ে মৈশুরে চলে যেতে চায় সে। চা(যেতে চাইলে সে বুঝলো—

> *"অমলের বিচ্ছেদস্মৃতি যে বাড়িকে বেষ্টন করিয়া জ্বলিতেছে, চা(দাবানলগ্রস্ত হরিণীর মতো সে বাড়ি পরিত্যাগ করিয়া পালাইতে চায়।—'কিন্তু আমার কথা সে একবার ভাবিয়া দেখিল না? আমি কোথায় পালাইব।"*[৬৫]

বিদায়কালে ভূপতি চা(কে সঙ্গে যেতে অনুরোধ করে। কিন্তু চা(সম্মত হয় না। ভূপতি-চা(র নীড় পরিণত হয় 'নষ্টনীড়'-এ।

১৩০৯ বঙ্গাব্দের চৈত্র সংখ্যায় 'বঙ্গদর্শন' পত্রে প্রকাশিত 'মাল্যদান' গল্পে গল্পকার কুড়ানির মনোবিকলন নয় মন-উন্মোচনের কাহিনিকে ব্যত্ত(করেছেন। যাকে বনবিহারিণী হরিণী বলে মনে হয় তার মধ্যেও যে হৃদয়ভারাতুরা যুবতী নারী রয়েছে, মুখের ভাষা কম থাকলেও হৃদয়ের অব্যত্ত(রহস্য ও অনির্বচনীয় বেদনা যে তার মধ্যেও থাকতে পারে এটা না বুঝতে

পেরে পটল তাকে যে প্রেমের খেলায় ঠেলে দিয়েছে তার জন্য তাকে অনুতপ্ত হতে হয়েছে। গল্পের এই প-ট বিন্যাসে গল্পকার নারীমনের চিরন্তন রহস্যের অতলে ডুব দিয়ে নারীত্বের ঊষা-বিকাশকে একটু একটু করে প্রত্য(করেছেন। যতীনের স্পর্শে কুড়ানির আজন্ম-আচ্ছন্ন নারীসত্ত্বা হঠাৎ বিকশিত হওয়ার সুযোগ পেয়েছে। অবশ্য এই পথে পৌঁছাতে কাহিনিতে বিশেষভাবে প্রভাব ফেলতে হয়েছে পটলকে। কুড়ানি একটি আশ্রিতা বালিকা। তাঁর আশ্রয়ের সূত্রে পটলের স্বামীর বক্ত(ব্য উদ্ধৃতিযোগ্য—

> *"পশ্চিমে থাকিতে দুর্ভি(র সময় আমরা একটি মেয়েকে লইয়া মানুষ করিতেছি—পটল তাহাকে কুড়ানি বলিয়া ডাকে। উহার বাপ-মা এবং ঐ মেয়েটি আমাদের বাংলার কাছে একটি গাছতলায় পড়িয়া ছিল। যখন খবর পাইয়া গেলাম গিয়া দেখি, উহার বাপ-মা মরিয়াছে, মেয়েটির প্রাণটুকু আছে মাত্র। পটল তাহাকে অনেক যত্নে বাঁচাইয়াছে। উহার জাতের কথা কেহ জানে না—তাহা লইয়া কেহ আপত্তি করিলেই পটল বলে, 'ও তো দ্বিজ(একবার মরিয়া এবার আমাদের ঘরে জন্মিয়াছে, উহার সাবেক জাত কোথায় ঘুচিয়া গেছে।"* [৬৬]

দুর্ভি(র করালগ্রাস থেকে সদ্য বেঁচে ওঠা মেয়েটি পটলকে 'মা' সম্বোধন করলে পটল তাকে 'দিদি' বলে ডাকতে বলে। বাস্তবিক 'মা' সম্বোধন বজায় থাকলে পটল তাকে নিয়ে কাহিনিতে বর্ণিত প্রেমের খেলা খেলাতে পারতো না। ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট হরকুমার বাবু এবং তার স্ত্রী পটল তাকে দুর্ভি(র হাত থেকে বাঁচাতে পারলেও দুর্ভি(র উপবাসে তার দেহে শূলবেদনা থেকে গেল।

উপরে উদ্ধৃত উক্তি(র সাপে(কুড়ানির আশ্রয়ের ধরণ নির্ণয় করতে গেলে দেখা যায় অনাথা দশা তার আশ্রয়ের একটি গৌণ কারণ। সেই গৌণ কারণটি যে মুখ্য কারণের প্রে(তে সৃষ্ট তার নাম 'দুর্ভি('। সুতরাং সমাজতাত্ত্বিক বী(ায় তা প্রাকৃতিক কারণের অন্তর্ভুক্ত(। এহেন আশ্রিতাকে নিয়ে পটলের এই আমোদের খেলা আমাদেরকে কুড়ানি সম্পর্কে সহানুভূতিশীল করে তোলে। পটল-যতীন খুড়তুতো-জ্যাঠতুতো ভাইবোন। বনহরিণী কুড়ানি যে প্রেম কী তা জানে না বা বোঝে না, তাকে যতীনের দিকে ঠেলে দিয়েছে সে। যতীন পটলের এই আচরণে কুণ্ঠিত হয়। ডাক্ত(ার হিসাবে রোগীর পরী(ার মধ্যে যে স্বাভাবিক দায়িত্ব-কর্তব্যের কথা থাকে

তাকে নিয়ে পরিহাস করতেও পটলের বাধেনি। যতীন একারণে হরকুমার বাবুকে সতর্ক করে বলেছে—পটলকে তার এতখানি প্রশ্রয় দেওয়া ঠিক নয়। পটলের নির্দেশে কুড়ানি আহাররত যতীনকে বাতাস করে, সন্ধ্যায় বকুলমালা হাতে যতীনের ঘরে যায়। লজ্জিত যতীন এই বাড়াবাড়ি মেনে নিতে পারে না। পটলের জন্য চিঠি লিখে এই উপদ্রব থেকে সে পালিয়ে যায়। যতীন পালানোর পর পটল আবিষ্কার করে কুড়ানির নারীসত্ত্বাকে। কুড়ানির সন্ধানে এসে দেখতে পায়—

> *"সে যতীনের পরিত্যক্ত ঘরে তাহার খাটের খুরা ধরিয়া মাটিতে পড়িয়া আছে—শূন্য শয্যাটাকে যেন পায়ে ধরিয়া সাধিতেছে। তাহার বুকের ভিতরে যে-একটি সুধার পাত্র লুকানো ছিল সেইটে যেন শূন্যতার চরণে বৃথা আক্রোসে উপুড় করিয়া ঢালিয়া দিতেছে ।"* [৬৭]

পটলের তখন আর অনুশোচনার অবধি থাকে না। বুঝতে পারে কতবড়ো অন্যায়, কত বড় ছেলেমি সে করে ফেলেছে। সুতরাং তার কাছে (মা চাওয়া ছাড়া আর পথ নেই। পরদিন দেখা গেল কুড়ানিও গৃহত্যাগ করেছে। যতীন এখন পে-গ-হাসপাতালে ডাক্তারি করে। এখানে নতুন এক রোগিণী ভর্তি হয়েছে। পরীক্ষার জন্য মুখের চাদর সরিয়ে যতীন দেখল, সেই কুড়ানি। নাড়ীতে তার জ্বর নেই কিন্তু দুর্বলতা অত্যন্ত। ইতিমধ্যে পটলের কাছ থেকে যতীন কুড়ানির সমস্ত বিবরণ শুনেছে। কুড়ানির শীর্ণ কপালের উপর কালির রেখা দেখে যতীনের আক্ষেপ—

> *"এই একটি মেয়েকে বিধাতা এত যত্নে ফুলের মতো সুকুমার করিয়া গড়িয়া দুর্ভিক্ষ হইতে মারীর মধ্যে ভাসাইয়া দিলেন কেন। আজ এই-যে পেলব প্রাণটি ক্লিষ্ট হইয়া বিছানার উপরে পড়িয়া আছে, ইহার এই অল্প কয়দিনের আয়ুর মধ্যে এত বিপদের আঘাত, এত বেদনার ভার সহিল কী করিয়া, ধরিল কোথায়। যতীনই-বা ইহার জীবনের মাঝখানে তৃতীয় আর একটি সংকটের মতো কোথা হইতে আসিয়া জড়াইয়া পড়িল।"* [৬৮]

যে ভালোবাসা জগতে দুর্লভ যতীন তা না চেয়েই পেয়েছে। যে ভালোবাসা এমনভাবে মৃত্যুর দ্বার পর্যন্ত এসে মূর্ছিত হয়ে পড়ে পৃথিবীর কোন লোক সেই দেবভোগ্য নৈবেদ্যলাভের অধিকারী। এরপর যতীন কর্তৃপক্ষের অনুমতি নিয়ে তাকে নিজের বাড়ীতে নিয়ে তোলে।

কুড়ানির বুকে সেই শুকনো বকুল ফুলের মালাটি দেখতে পেয়ে যতীন বুঝলো মালাটা কী। এরপর পটলকে পত্র মারফত যতীনের গৃহে নিয়ে আসা হয়। আড়ালে যতীনের কাছে জানতে পারে—কুড়ানির আর আশা নেই। যতীন কুড়ানিকে অনুরোধ করে ঐ মালাটি তার গলায় পরিয়ে দিতে। মৃত্যুপথগামিনী কুড়ানি পূর্বকৃত অনাদরের অভিমানে বলে—কী হবে, দাদাবাবু। যতীন তাকে শোনায় সে কুড়ানিকে ভালোবাসে। কুড়ানি গলার শুকনো বকুল ফুলের মালাটি খুলে যতীনের গলায় পরিয়ে দেয়। দিদি পটলের জন্য যে স্বপ্ন সে দেখেছিল, মনে মনে যে স্বপ্নকে পালন করে এসেছে আজ মৃত্যুপথে স্বর্গীয় প্রেমের সাধনায় সে প্রেম সফল হয়। পটল ব্যাগ থেকে কুড়ানির কাপড়-গহনা বের করে বেনারসি-চুড়ি-বালায় তাকে সাজিয়ে তোলে। যতীনের হাতে একটি সোনার হার তুলে দিয়ে কুড়ানিকে পরিয়ে দিতে বলে। ভোরের আলো কুড়ানির মুখে এসে পড়তেই মনে হল কুড়ানি যেন মরেনি। সে যেন এক অতলস্পর্শ সুখের মধ্যে নিমগ্ন হয়ে আছে। কুড়ানির মৃতদেহ নিয়ে যাবার সময় পটল তার বুকের উপর কাঁদতে কাঁদতে বলে—জীবনের চেয়ে তোর মরণ সুখের। যতীন সেই শান্তস্নিগ্ধ মৃত্যুচ্ছবির দিকে চেয়ে ভাবতে থাকে—যাঁর ধন তিনি নিলেন। আমাকেও বঞ্চিত করলেন না।

আশ্রিতা কুড়ানির উপর আশ্রয়দাত্রীর যে উপদ্রব তাকে সমালোচনা করা যায়। কিন্তু একথা বলতেই হবে সে যা করেছে তা না বুঝে এবং কুড়ানিকে ভালোবাসার অধিকার থেকে করেছে। এ নিয়ে পাঠকের মনে প্রথমে যে বেদনা তৈরী হয়েছিল তা শেষপর্যন্ত প্রশমিত হয়। কারণ যতীনকে সে মাল্যদানের মাধ্যমে গ্রহণ করতে পেরেছে। যতীনও তাকে হার পরিয়ে স্বীকৃতি দিয়েছে। কিন্তু ততদিনে অনেক দেরী হয়ে গেছে। তার এই মৃত্যুর জন্য পটল-যতীনকে পুরোপুরি দায়ী করা যায় না। কারণ দুর্ভি(র উপবাসে শূলবেদনা নিয়েই সে কাহিনিতে আবির্ভূত। হয়তো মৃত্যু তার হতই। যতীন-পটলের প্রেম-প্রেম খেলার কারণে সেই মৃত্যুর গতি ত্বরান্বিত হয়ে এগিয়ে এসেছে। তবু মৃত্যুর পূর্বে যতটুকু সুখ পেয়ে গেছে কুড়ানি তা হয়তো পটলের উক্তি(মতো—জীবনের চেয়ে তার মরণ সুখের।

'মাল্যদান' গল্প রচনার অনতিবিলম্বে রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'কর্মফল' (১৩১০, পৌষ) গল্পখানি রচনা করেন। গল্পটি রচনার (ে ত্রে একটি উদ্দেশ্য ছিল। ভূদেব চৌধুরী তাঁর 'বাংলা সাহিত্যের ছোটগল্প ও গল্পকার' গ্রন্থে জানিয়েছেন—

''এই যুগের 'কর্মফল' গল্পটি লিখেছিলেন ফরমায়েস-এর